মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন ; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যাবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বতপ্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে ; অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মতো মা'র কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখনো-কখনো তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছুকিছু ধূলিক্ষেপও করে ; তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এইসমস্ত ধূলামাটি সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন দেউড়ির দরোয়ানগুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোশাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই। সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান ; তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।

আশ্বিন ১৩১০

সৌন্দর্যবোধ

প্রথম-বয়সে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া নিয়মে সংযমে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ভারতবর্ষের এই প্রাচীন উপদেশের কথা তুলিতে গেলে অনেকের মনে এই তর্ক উঠিবে, এ যে বড়ো কঠোর সাধনা। ইহার দ্বারা নাহয় খুব একটা শক্ত মানুষ তৈরি করিয়া তুলিলে, নাহয় বাসনার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া মস্ত একজন সাধুপুরুষ হইয়া উঠিলে, কিন্তু এ সাধনার রসের দান কোথায়? কোথায় গেল সাহিত্য, চিত্র, সংগীত? মানুষকে যদি পুরা করিয়া তুলিতে হয় তবে সৌন্দর্যচর্চাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।

এ তো ঠিক কথা। সৌন্দর্য তো চাই। আত্মহত্যা তো সাধনার বিষয় হইতে পারে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। বস্তুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্যপালন শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিয়া তুলিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না। চাষা যখন লাঙল দিয়া মাটি বিদীর্ণ করে, মই দিয়া ঢেলা দলিয়া গুঁড়া করিতে থাকে, নিড়ানি দিয়া সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপড়াইয়া ক্ষেত্রটাকে একেবারে শূন্য করিয়া ফেলে, তখন আনাড়ি লোকের মনে হইতে পারে, জমিটার উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। কিন্তু এমনি করিয়াই ফল ফলাইতে হয়। তেমনি যথার্থভাবে রসগ্রহণের অধিকারী হইতে গেলে গোড়ায় কঠিন চাষেরই দরকার। রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে। সে পথে সমস্ত বিপদ এড়াইয়া পূর্ণতালাভ করিতে যে চায় নিয়মসংযম তাহারই বেশি আবশ্যক। রসের

জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, উপলক্ষের দ্বারা লক্ষ্য প্রায়ই চাপা পড়ে ; সে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদি শিখিয়া বসে ; ধনী হইতে চায়, টাকা জমাইয়া কৃপাপাত্র হইয়া ওঠে ; দেশের হিত চায়, কমিটিতে রেজোল্যুশন পাস করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

তেমনি নিয়ম-সংযমটাই চরম লক্ষ্যের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে, এ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। নিয়মটাকেই যাহারা লাভ, যাহারা পুণ্য মনে করে, তাহারা নিয়মের লোভে একেবারে লুব্ধ হইয়া উঠে। নিয়মলোলুপতা ষড়্‌রিপুর জায়গায় সপ্তম রিপু হইয়া দেখা দেয়।

এটা মানুষের জড়ত্বের একটা লক্ষণ। সঞ্চয় করিতে শুরু করিলে মানুষ আর থামিতে চায় না। বিলাতের কথা শুনিতে পাই, সেখানে কত লোক পাগলের মতো কেবল দেশ-বিদেশের ছাপ-মারা ডাকের টিকিট সংগ্রহ করিতেছে, সেজন্য সন্ধানের এবং খরচের অন্ত নাই। এইরূপ সংগ্রহবায়ুদ্বারা খেপিয়া উঠিয়া কেহ-বা চীনের বাসন, কেহ-বা পুরাতন জুতা সংগ্রহ করিয়া মরিতেছে। উত্তরমেরুর ঠিক কেন্দ্রস্থানটিতে গিয়া কোনোমতে একটা ধ্বজা পুঁতিয়া আসিতে হইবে সেও এমনি একটা ব্যাপার। সেখানে বরফের ক্ষেত্র ছাড়া আর-কিছু নাই, কিন্তু মন নিবৃত্ত হইতেছে না—কে সেই মেরুমরুর কেন্দ্রবিন্দুটির কত মাইল কাছে যাইতেছে তাহারই অঙ্কপাতের নেশা পাইয়া বসিয়াছে। পাহাড়ে যে যত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে সে ততটাকেই একটা লাভ বলিয়া গণ্য করিতেছে ; এই শূন্য লাভের জন্য নিজে মরিতেছে এবং কত অনিচ্ছুক মজুরদিগকে জোর করিয়া মারিতেছে, তবু থামিতে চাহিতেছে না।

অপব্যয় এবং ক্লেশ যতই বেশি প্রয়োজনহীন সঞ্চয় ও পরিণামহীন জয়লাভের গৌরবও তত বেশি বলিয়া বোধ হয়। নিয়মসাধনার লোভও ক্লেশের পরিমাণ খতাইয়া আনন্দভোগ করে। কঠিন শয্যায় শুইয়া যদি শুরু করা যায় তবে মাটিতে বিছানা পাতিয়া, পরে একখানিমাত্র কম্বল বিছাইয়া, পরে কম্বল ছাড়িয়া শুধু মাটিতে শুইবার লোভ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। কৃচ্ছ্রসাধনটাকেই লাভ মনে করিয়া শেষকালে আত্মঘাতে আসিয়া দাঁড়ি টানিতে হয়। ইহা আর-কিছু নয়, নিবৃত্তিকেই একটা প্রচণ্ড প্রবৃত্তি করিয়া তোলা, গলার ফাঁস ছিঁড়িবার চেষ্টাতেই গলায় ফাঁস আঁটিয়া মরা।

অতএব কেবলমাত্র নিয়ম পালন করাটাকেই যদি লোভের জিনিস করিয়া তোলা যায়, তবে কঠোরতার চাপ কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়া স্বভাব হইতে সৌন্দর্যবোধকে একেবারে পিষিয়া বাহির করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ণতালাভের প্রতিই লক্ষ রাখিয়া সংযমচর্চাকেও যদি ঠিকমত সংযত করিয়া রাখিতে পারি তবে মনুষ্যত্বের কোনো উপাদানই আঘাত পায় না, বরঞ্চ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

কথাটা এই যে, ভিত-মাত্রই শক্ত হইয়া থাকে, না হইলে তাহা আশ্রয় দিতে পারে না। যা-কিছু ধারণ করিয়া থাকে যাহা আকৃতিদান করে, তাহা কঠিন। মানুষের শরীর যতই নরম হোক-না কেন, যদি শক্ত হাড়ের উপরে তাহার পত্তন না হইত তবে

সে একটা পিণ্ড হইয়া থাকিত, তাহার চেহারা খুলিতই না। তেমনি জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত, আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত। জ্ঞানের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তো সে কেবল খাপছাড়া স্বপ্ন হইত, আর আনন্দের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তাহা নিতান্তই পাগলামি মাতলামি হইয়া উঠিত।

এই-যে শক্ত ভিত্তি ইহাই সংযম। ইহার মধ্যে বিচার আছে, বল আছে, ত্যাগ আছে; ইহার মধ্যে নির্মম দৃঢ়তা আছে। ইহা দেবতার মতো এক হাতে বর দেয়, আর-এক হাতে সংহার করে। এই সংযম গড়িবার বেলাও যেমন দৃঢ় ভাঙিবার বেলাও তেমনি কঠিন। সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন ; নতুবা প্রবৃত্তি অসংযত থাকিলে শিশু ভাতের থালা লইয়া যেমন অন্নব্যঞ্জন কেবল গায়ে মাখিয়া মাটিতে ছড়াইয়া বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোলে, অথচ অল্পই তাহার পেটে যায়, ভোগের সামগ্রী লইয়া আমাদের সেই দশা হয় ; আমরা কেবল তাহা গায়েই মাখি, লাভ করিতে পারি না।

সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুনের উপরে দখল রাখা চাই। প্রবৃত্তি-সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই তবে যে সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে ; ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।

এ কথা সত্য, সংসারে আমাদের ক্ষুধিত প্রবৃত্তি যেখানে পাত পাড়িয়া বসে তাহার কাছাকাছি প্রায়ই একটা সৌন্দর্যের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ফল যে কেবল আমাদের পেট ভরায় তাহা নহে, তাহা স্বাদে গন্ধে দৃশ্যে সুন্দর। কিছুমাত্র সুন্দর যদি নাও হইত তবু আমরা তাহাকে পেটের দায়েই খাইতাম। আমাদের এতবড়ো একটা গরজ থাকা সত্ত্বেও কেবল পেট ভরাইবার দিক হইতে নয়, সৌন্দর্যভোগের দিক হইতেও সে আমাদিগকে আনন্দ দিতেছে। এটা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ।

জগতে সৌন্দর্য বলিয়া এই-যে আমাদের একটা উপরি-পাওনা ইহা আমাদের মনকে কোন্ দিকে চালাইতেছে? ক্ষুধাতৃপ্তির ঝোঁকটাই যাহাতে একেশ্বর হইয়া না ওঠে, যাহাতে আমাদের মন হইতে তাহার ফাঁস একটু আলগা হয়, সৌন্দর্যের সেই চেষ্টা দেখিতে পাই। চণ্ডী ক্ষুধা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিতেছে, তোমাকে খাইতেই হইবে—ইহার উপরে আর-কোনো কথা নাই। অমনি সৌন্দর্যলক্ষ্মী হাসিমুখে সুধাবর্ষণ করিয়া অত্যুগ্র প্রয়োজনের চোখ-রাঙানিকে আড়াল করিয়া দিতেছেন, পেটের জ্বালাকে নীচের তলায় রাখিয়া উপরের মহালে আনন্দভোজের মনোহর আয়োজন করিতেছেন। অনিবার্য প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের একটা অবমাননা আছে ; কিন্তু সৌন্দর্য নাকি প্রয়োজনের বাড়া, এইজন্য সে আমাদের অপমান দূর করিয়া দেয়। সৌন্দর্য আমাদের ক্ষুধাতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সর্বদা একটা উচ্চতর সুর লাগাইতেছে বলিয়াই, যাহারা একদিন অসংযত বর্বর ছিল তাহারা আজ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, যে কেবল ইন্দ্রিয়েরই দোহাই মানিত

সে আজ প্রেমের বশ মানিয়াছে। আজ ক্ষুধা লাগিলেও আমরা পশুর মতো, রাক্ষসের মতো, যেমন-তেমন করিয়া খাইতে বসিতে পারি না ; শোভনতাটুকু রক্ষা না করিলে আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই চলিয়া যায়। অতএব এখন আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই একমাত্র নহে, শোভনতা তাহাকে নরম করিয়া আনিয়াছে। আমরা ছেলেকে লজ্জা দিয়া বলি, ছি ছি, অমন লোভীর মতো খাইতে আছে! সেরূপ খাওয়া দেখিতে কুশ্রী। সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব ; আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি।

তবেই দেখা যাইতেছে, পরিণামে সৌন্দর্য মানুষকে সংযমের দিকেই টানিতেছে। মানুষকে সে এমন একটি অমৃত দিতেছে যাহা পান করিয়া মানুষ ক্ষুধার রূঢ়তাকে দিনে দিনে জয় করিতেছে। অসংযমকে অমঙ্গল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে যাহার মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় সে তাহাকে অসুন্দর বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে চাহিতেছে।

সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে, আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেমনি আমাদের সৌন্দর্য-ভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্যের মর্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না। একপরয়াণা সতী স্ত্রীই তো প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারে, স্বৈরিণী তো পারে না। সতীত্ব সেই চাঞ্চল্যবিহীন সংযম যাহার দ্বারা গভীরভাবে প্রেমের নিগূঢ় রস লাভ করা সম্ভব হয়। আমাদের সৌন্দর্য-প্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীত্বের সংযম না থাকে তবে কী হয়? সে কেবলই সৌন্দর্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে ; যাহাকে পাইলে সে একেবারে সব ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে পারিত তাহাকে পায় না। যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না।

পৌষ্যরাজা ঋষিকুমার উতঙ্ককে কহিলেন, যাও, অন্তঃপুরে যাও, সেখানে মহিষীকে দেখিতে পাইবে। উতঙ্ক অন্তঃপুরে গেলেন, কিন্তু মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। অশুচি হইয়া কেহ সতীকে দেখিতে পাইত না ; উতঙ্ক তখন অশুচি ছিলেন।

বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে সতীলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন তিনিও আমাদের সম্মুখেই আছেন, কিন্তু শুচি না হইলে দেখিতে পাইব না। যখন বিলাসে হাবুডুবু খাই, ভোগের নেশায় মাতিয়া বেড়াই, তখন বিশ্বজগতের আলোক-বসনা সতীলক্ষ্মী আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান করেন।

এ কথা ধর্মনীতিপ্রচারের দিক হইতে বলিতেছি না ; আনন্দের দিক হইতে, যাহাকে ইংরেজিতে আর্ট বলে, তাহারই তরফ হইতে বলিতেছি। আমাদের শাস্ত্রেও বলে, কেবল ধর্মের জন্য নয়, সুখের জন্যও সংযত হইবে। সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। অর্থাৎ ইচ্ছার যদি চরিতার্থতা চাও তবে ইচ্ছাকে শাসনে রাখো, যদি সৌন্দর্যভোগ করিতে চাও তবে ভোগ-লালসাকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও। প্রবৃত্তিকে যদি দমন করিতে না

জানি তবে প্রবৃত্তিরই চরিতার্থতাকে আমরা সৌন্দর্যবোধের চরিতার্থতা বলিয়া ভুল করি, যাহা চিত্তের জিনিস তাহাকে দুই হাতে করিয়া দলিয়া মনে করি তাহাকে পাইলাম। এইজন্যই বলিয়াছি, সৌন্দর্যবোধ ঠিকমতো-উদ্‌বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্যের সাধনই আবশ্যক।

যাঁহাদের চোখে ধুলা দেওয়া শক্ত তাঁহার হঠাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিবেন, এ যে একেবারে কবিত্ব আসিয়া পড়িল। তাঁহারা বলিবেন, সংসারে তো আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে-সকল কলাকুশল গুণী সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই সংযমের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই। তাঁহাদের জীবনচরিতটা পাঠ্য নহে।

অতএব কবিত্ব রাখিয়া এই বাস্তব সত্যটার আলোচনা কর দরকার।

আমার বক্তব্য এই যে, বাস্তবকে আমরা এত বেশি বিশ্বাস করি কেন? কারণ, সে প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু অনেক স্থলেই মানুষের সম্বন্ধে আমরা যাহাকে বাস্তব বলি তাহার বেশির ভাগই আমাদের অপ্রত্যক্ষ। একটুখানি দেখিতে পাই বলিয়া মনে করি সবটাই যেন দেখিতে পাইলাম, এইজন্য মানুষ-ঘটিত বাস্তব বৃত্তান্ত লইয়া একজন যাহাকে সাদা বলে আর-একজন তাহাকে মেটে বলিলেও বাঁচিতাম, তাহাকে একেবারে কালো বলিয়া বসে। নেপোলিয়নকে কেহ বলে দেবতা, কেহ বলে দানব। আকবরকে কেহ বলে উদার প্রজাহিতৈষী, কেহ বলে তাঁহার হিন্দুপ্রজার পক্ষে তিনিই যত নষ্টের গোড়া। কেহ বলেন বর্ণভেদেই আমাদের হিন্দুসমাজ রক্ষা করিয়াছে, কেহ বলে বর্ণভেদের প্রথাই আমাদের হিন্দু-সমাজ রক্ষা করিয়াছে, কেহ বলে বর্ণভেদের প্রথাই আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া দিল। অথচ উভয়পক্ষেই বাস্তব সত্যের দোহাই দেয়।

বস্তুত মানুষ-ঘটিত ব্যাপারে একই জায়গায় আমরা অনেক উল্টা কাণ্ড দেখিতে পাই। মানুষের দেখা-অংশের মধ্যে যে-সকল বৈপরীত্য প্রকাশ পায় মানুষের না-দেখা অংশের মধ্যেই নিশ্চয় তাহার একটা নিগূঢ় সমন্বয় আছে ; অতএব আসল সত্যটা যে প্রত্যক্ষের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে, অপ্রত্যক্ষের মধ্যেই ডুবিয়া আছে—এইজন্যই তাহাকে লইয়া এত তর্ক, এত দলাদলি এবং এইজন্যই একই ইতিহাসকে দুই বিরুদ্ধ পক্ষে ওকালতনামা দিয়া থাকে।

জগতের কলানিপুণ গুণীদের সম্বন্ধেও যেখানে আমরা উল্টা কাণ্ড দেখিতে পাই সেখানেও বাস্তব সত্যের বড়াই করিয়া হঠাৎ কিছু বিরুদ্ধ কথা বলিয়া বসা যায় না। সৌন্দর্যসৃষ্টি দুর্বলতা হইতে চঞ্চলতা হইতে অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা। বাস্তব সত্য সাক্ষ্য দিলেও আমরা বলিব, নিশ্চয় সকল সাক্ষীকে হাজির পাওয়া যায় নাই ; আসল সাক্ষীটি পালাইয়া বসিয়া আছে। যদি দেখি কোনো ডাকাতের দল খুবই উন্নতি করিতেছে তবে সেই বাস্তব সত্যের সহায়ে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দস্যুবৃত্তিই উন্নতির উপায়। তখন এই কথা বিনা প্রমাণেই বলা যাইতে পারে যে, দস্যুদের আপাতত যেটুকু উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহার মূল কারণ নিজেদের মধ্যে ঐক্য, অর্থাৎ দলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ধর্মরক্ষা ; আবার এই

উন্নতি যখন নষ্ট হইবে তখন এই ঐক্যকেই নষ্ট হইবার কারণ বলিয়া বসিব না, তখন বলিব অন্যের প্রতি অধর্মাচরণই তাহাদের পতনের কারণ। যদি দেখি একই লোক বাণিজ্যে প্রচুর টাকা করিয়া ভোগে তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন তবে এ কথা বলিব না যে, যাহারা টাকা নষ্ট করিতে পারে টাকা উপার্জনের পন্থা তাহারাই জানে ; বরং এই কথাই বলিব, টাকা রোজগার করিবার ব্যাপারে এই লোকটি হিসাবী ছিলেন, সেখানে তাঁর সংযম ও বিবেচনা-শক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, আর টাকা উড়াইবার বেলা তাঁহার উড়াইবার ঝোঁক হিসাবের বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

কলাবান্ গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী সেখানে তাঁহারা তপস্বী ; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না, সেখানে চিত্তের সাধন ও সংযম আছেই। অল্প লোকই এমন পুরাপুরি বলিষ্ঠ যে তাঁহাদের ধর্মবোধকে ষোলো-আনা কাজে লাগাইতে পারেন। কিছু-না-কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে। কারণ, আমরা সকলেই হীনতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, চরমে আসিয়া দাঁড়াই নাই। কিন্তু জীবনে আমরা যে-কোনো স্থায়ী বড়ো জিনিস গড়িয়া তুলি, তাহা আমাদের অন্তরের ধর্মবুদ্ধির সাহায্যেই ঘটে, ভ্রষ্টতার সাহায্যে নহে। গুণী ব্যক্তিরাও যেখানে তাঁহাদের কলারচনা স্থাপন করিয়াছেন সেখানে তাঁহাদের চরিত্রই দেখাইয়াছেন, যেখানে তাঁহাদের জীবনকে নষ্ট করিয়াছেন সেখানে চরিত্রের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে, তাঁহাদের মনের ভিতরে ধর্মের যে একটি সুন্দর আদর্শ আছে রিপুর টানে তাহার বিরুদ্ধে গিয়া পীড়িত হইয়াছেন। গড়িয়া তুলিতে সংয দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম। ধারণা করিতে সংযম চাই, আর মিথ্যা বুঝিতেই অসংযম।

এখানে কথা উঠিবে, তবেই তো একই মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবিকাশের ক্ষমতা ও চরিত্রের অসংযম একত্রই থকিতে পারে, তবে তো দেখি বাঘে গোরুতে এক ঘাটেই জল খায়।

বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় না বটে, কিন্তু সে কখন? যখন বাঘও পূর্ণতা পাইয়া উঠিয়াছে, গোরুও পূর্ণ গোরু হইয়াছে। শিশু অবস্থায় উভয়ে একসঙ্গে খেলা করিতে পারে; বড়ো হইলে বাঘও ঝাঁপ দিয়া পড়ে, গোরুও দৌড় দিতে চেষ্টা করে।

তেমনি সৌন্দর্যবোধের যথার্থ পরিণতভাব কখনোই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ চিত্তের অসংযমের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে টিঁকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।

যদি বল কেন বিরোধী, তাহার কারণ আছে। বিশ্বামিত্র বিধাতার সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেটা তাঁহার ক্রোধের সৃষ্টি, দম্ভের সৃষ্টি ; সুতরাং সেই জগৎ বিধাতার জগতের সঙ্গে মিশ খাইল না, তাহাকে স্পর্ধা করিয়া আঘাত করিতে লাগিল, খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া হইয়া রহিল, চরাচরের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিল না—অবশেষে পীড়া দিয়া পীড়া পাইয়া সেটা মরিল।

আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি

করিতে থাকে। তখন চারিদিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ, আমাদের লোভ নিজের চারি দিকে এমন-সকল বিকার উৎপাদন করে যাহাতে ছোটোই বড়ো হইয়া উঠে, বড়োই ছোটো হইয়া যায় ; যাহা ক্ষণকালের তাহাকেই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে তাহাকে আমরা এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড়ো বড়ো সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্যতারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের সৃষ্টি বিধাতার সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।

মনে করো নদী চলিতেছে ; তাহার প্রত্যেক ঢেউ স্বতন্ত্র হইয়া মাথা তুলিতেও তাহারা সকলে মিলিয়া সেই এক সমুদ্রের দিকে গান করিতে করিতে চলিতেছে। কেহ কাহাকেও বাধা দিতেছে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোথাও পাক পড়িয়া যায় তবে সেই ঘূর্ণা এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া উন্মত্তের মতো ঘুরিতে থাকে ; চলিবার বাধা দিয়া ডুবাইবার চেষ্টা করে ; সমস্ত নদীর যে গতি, যে অভিপ্রায়, তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া সে স্থিরত্বও লাভ করে না, অগ্রসর হইতেও পারে না।

আমাদের কোনো-একটা প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিলে সেও আমাদিগকে নিখিলের প্রবাহ হইতে টানিয়া লইয়া একটা বিন্দুর উপরেই ঘুরাইয়া মারিতে থাকে। আমাদের চিত্ত সেই একটা কেন্দ্রের চারি দিকেই বাঁধা পড়িয়া তাহার মধ্যে আপনার সমস্ত বিসর্জন করিতে ও অন্যের সমস্ত নষ্ট করিতে চায়। এই উন্মত্ততার মধ্যে একদল লোক এক রকমের সৌন্দর্য দেখে। এমন-কি, আমার মনে হয় য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই পাক-খাওয়া প্রবৃত্তির ঘূর্ণিনৃত্যের প্রলয়োৎসব, যাহার কোনো পরিণাম নাই, যাহার কোথাও শান্তি নাই, তাহাতেই যেন বেশি সুখ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাকে আমরা শিক্ষার সম্পূর্ণতা বলিতে পারি না, ইহা স্বভাবের বিকৃতি। সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে দেখিলে যাহাকে হঠাৎ মনোহর বলিয়া বোধ হয় নিখিলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার সৌন্দর্যের বিরোধ চোখে ধরা পড়ে। মদের বৈঠকে মাতাল জগৎ-সংসারকে ভুলিয়া গিয়া নিজেদের সভাকে বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপ্রমত্ত দর্শন চারি দিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে। আমাদের প্রবৃত্তিরও উৎপাত যখন ঘটে তখন সে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিলাভ করিলেও বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে তাহাকে ধরিয়া দেখিলেই তাহার কুশ্রীতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এমনি করিয়া স্থিরভাবে যে ব্যক্তি বড়োর সঙ্গে ছোটোকে, সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেককে মিলাইয়া দেখিতে না জানে, সে উত্তেজনাকেই আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দর্য বলিয়া ভ্রম করে। এইজন্যই সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি নাই ; তাহা অসংযমের দ্বারা হইবার জো নাই।

সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণতা কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহাই দেখা যাক।

ইহা দেখা গেছে, বর্বরজাতি যাহাকে সুন্দর বলিয়া আদর করে সভ্য-জাতি তাহাকে দূরে ফেলিয়া দেয়। ইহার প্রধান কারণ, বর্বরের মন যেটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে আছে সভ্য লোকের মন সেটুকুর ক্ষেত্রের মধ্যে নাই। ভিতরে ও বাহিরে, দেশে ও কালে সভ্যজাতির

জগৎটাই যে বড়ো এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বিচিত্র। এইজন্যই বর্বরের জগতে ও সভ্যের জগতে বস্তুর মাপ এবং ওজন এক হইতেই পারে না।

ছবি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি আনাড়ি সে একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রঙচঙ বা গোলগাল আকৃতি দেখিলেই খুশি হইয়া ওঠে। ছবিকে সে বড়ো ক্ষেত্রে রাখিয়া দেখিতেছে না। এখানে তাহার ইন্দ্রিয়ের রাশ টানিয়া ধরিবে এমন কোনো উচ্চতর বিচারবুদ্ধি নাই। গোড়াতেই যাহা তাহাকে আহ্বান করে তাহারই কাছে সে আপনাকে ধরা দিয়া বসে। রাজবাড়ির দেউড়ির দরোয়ানজির চাপরাস ও চাপদাড়ি দেখিয়া তাহাকেই সর্বপ্রধান ব্যক্তি মনে করিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়ে, দেউড়ি পার হইয়া সভায় যাইবার কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করিতেই পারে না। কিন্তু যে লোক এতবড়ো গ্রাম্য নহে সে এত সহজে ভোলে না। সে জানে, দরোয়ানের মহিমাটা হঠাৎ খুব বেশি করিয়া চোখে পড়ে বটে, কারণ চোখে পড়ার বেশি মহিমা যে তাহার নাই। রাজার মহিমা কেবলমাত্র চোখে পড়িবার বিষয় নহে, তাহাকে মন দিয়াও দেখিতে হয়। এইজন্য রাজার মহিমার মধ্যে একটা শক্তি শান্তি ও গাম্ভীর্য আছে।

অতএব যে ব্যক্তি সমজদার ছবিতে সে একটা রঙচঙের ঘটা দেখিলেই অভিভূত হইয়া পড়ে না। সে মুখ্যের সঙ্গে গৌণের, মাঝখানের সঙ্গে চারি পাশের, সম্মুখের সঙ্গে পিছনের একটা সামঞ্জস্য খুঁজিতে থাকে। রঙচঙে চোখ ধরা পড়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যের সুষমা দেখিতে মনের প্রয়োজন। তাহাকে গভীরভাবে দেখিতে হয়, এইজন্য তাহার আনন্দ গবীরতর।

এই কারণে অনেক গুণী দেখা যায়, বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাঁহারা আমল দিতে চান না ; তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে যেন একটা কঠোরতা আছে। তাঁহাদের ধ্রুপদের মধ্যে খেয়ালের তান নাই। হঠাৎ তাহার বাহিরের রিক্ততা দেখিয়া ইতর লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে ; অথচ সেই নির্মল রিক্ততার গবীরতর ঐশ্বর্যই বিশিষ্ট লোকের চিত্তকে বৃহৎ আনন্দ দান করে।

তবেই দেখা যাইতেছে, শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্যকে বড়ো করিয়া দেখা যায় না। এই মনের দৃষ্টি লাভ করা বিশেষ শিক্ষার কর্ম।

মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধিবিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া যায়, ধর্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরো অনেক দূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্ম দৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।

অতএব যে দেখাতে আমাদের মনের বড়ো অংশ অধিকার করে সেই দেখাতেই আমরা বেশি তৃপ্তি পাই। ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে মানুষের মুখ আমাদিগকে বেশি টানে, কেননা, মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা নয়, তাহাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে ; তাহা আমাদের চৈতন্যকে বুদ্ধিকে হৃদয়কে দখল করিয়া বসে।

তাহা আমাদের কাছে শীঘ্র ফুরাইতে চায় না।

আবার মানুষের মধ্যে যাঁহারা নরোত্তম, ধরাতলে যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রকাশ, তাঁহারা আমাদের মনে এতদূর পর্যন্ত টান দেন, সেখানে আমরা নিজেরাই নাগাল পাই না। এইজন্য যে রাজপুত্র মানুষের দুঃখমোচনের উপায়চিন্তা করিতে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য কত চিত্র-রচনায় লাগাইয়াছে তাহার সীমা নাই।

এইখানে সন্দিগ্ধ লোকেরা বলিবেন, সৌন্দর্য হইতে যে ধর্মনীতির কথা আসিয়া পড়িল! দুটোতে ঘোলাইয়া দিবার দরকার কী? যাহা ভালো তাহা ভালো এবং যাহা সুন্দর তাহা সুন্দর। ভালো আমাদের মনকে এক রকম করিয়া টানে, সুন্দর আমাদের মনকে আর-এক রকম করিয়া টানে, উভয়ের আকর্ষণপ্রণালীর বিভিন্নতা আছে বলিয়াই ভাষায় দুটোকে দুই নাম দিয়া থাকে। যাহা ভালো তাহার প্রয়োজনীয়তা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, আর যাহা সুন্দর তাহা যে কেন মুগ্ধ করে সে আমরা জানি না।

এ সম্বন্ধে আমার বলিবার একটা কথা এই যে, মঙ্গল আমাদের ভালো করে বলিয়াই যে তাহাকে আমরা ভালো বলি ইহা বলিলে সবটা বলা হয় না। যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজনসাধন করে এবং তাহা সুন্দর ; অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতিপণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি-উপদেশ দিয়া মঙ্গলপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে তাহার অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বস্তুত মঙ্গল যে সুন্দর সে আমাদের প্রয়োজনসাধন করে বলিয়া নহে। ভাত আমাদের কাজে লাগে, কাপড় আমাদের কাজে লাগে, ছাতা-জুতা আমাদের কাজে লাগে ; ভাত-কাপড় ছাতা-জুতা আমাদের মনে সৌন্দর্যের পুলক সঞ্চার করে না। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সংগীত বাজাইয়া তোলে। ইহা সুন্দর ভাষাতেই, সুন্দর ছন্দেই, সুন্দর করিয়া সাজাইয়া স্থায়ী করিয়া রাখিবার বিষয়। ছোটো ভাই বড়ো ভাইয়ের সেবা করিলে সমাজের হিত হয় বলিয়া যে এ কথা বলিতেছি তাহা নহে, ইহা সুন্দর বলিয়াই। কেন সুন্দর? কারণ, মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য আর আমাদের অগোচর থাকে না। করুণা সুন্দর, ক্ষমা সুন্দর, প্রেম সুন্দর ; শতদল পদ্মের সঙ্গে, পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় ; শতদল পদ্মের মতো, পূর্ণিমার চাঁদের মতো নিজের মধ্যে এবং চারি দিকের জগতের মধ্যে তাহার একটি বিরোধহীন সুষমা আছে ; সে নিখিলের অনুকূল এবং নিখিল তাহার অনুকূল। আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্য-মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।

সৌন্দর্যে ও মঙ্গলে যে জায়গায় মিল আছে সে জায়গাটা বিচার করিয়া দেখা যাক।

আমরা প্রথমে দেখাইয়াছি, সৌন্দর্য প্রয়োজনের বাড়া। এইজন্য তাহাকে আমরা ঐশ্বর্য বলিয়া মানি। এইজন্য তাহা আমাদিগকে নিছক স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তি দেয়।

মঙ্গলের মধ্যে আমরা সেই ঐশ্বর্য দেখি। যখন দেখি, কোনো বীরপুরুষ ধর্মের জন্য স্বার্থ ছাড়িয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, তখন এমন একটা আশ্চর্য পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে যাহা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বেশি, আমাদের স্বার্থের চেয়ে বড়ো, আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ। মঙ্গল নিজের এই ঐশ্বর্যের জোরে ক্ষতি ও ক্লেশকে ক্ষতি ও ক্লেশ বলিয়া গণ্যই করে না। স্বার্থের ক্ষতিতে তাহার ক্ষতি হইবার জো নাই। এইজন্য সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগে প্রবৃত্ত করে, মঙ্গলও সেইরূপ করে। সৌন্দর্যও জগদ্‌ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে, মঙ্গলও মানুষের জীবনের মধ্যে তাহাই করিয়া থাকে। মঙ্গল, সৌন্দর্যকে শুধু চোখের দেখা নয়, শুধু বুদ্ধির বোঝা নয়, তাহাকে আরো ব্যাপাক আরো গভীর করিয়া মানুষের কাছে আনিয়া দিয়াছে ; তাহা ঈশ্বরের সামগ্রীকে অত্যন্তই মানুষের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত মঙ্গল মানুষের নিকটবর্তী অন্তরতম সৌন্দর্য ; এইজন্যই তাহাকে আমরা অনেক সময় সহজে সুন্দর বলিয়া বুঝতে পারি না, কিন্তু যখন বুঝি তখন আমাদের প্রাণ বর্ষার নদীর মতো ভরিয়া উঠে। তখন আমরা তাহার চেয়ে রমণীয় আর-কিছুই দেখি না।

ফুলপাতা, প্রদীপের মালা এবং সোনারুপার থালি দিয়া যদি ভোজের জায়গা সাজাইতে পারো সে তো ভালোই ; কিন্তু নিমন্ত্রিত যদি যজ্ঞকর্তার কাছ হইতে সমাদর না পায়, হৃদ্যতা না পায়, তবে সে-সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য তাহার কাছে রোচে না—কারণ এই হৃদ্যতাই অন্তরের ঐশ্বর্য, অন্তরের প্রাচুর্য। হৃদ্যতার মিষ্টহাস্য মিষ্টবাক্য মিষ্টব্যবহার এমন সুন্দর যে তাহা কলার পাতাকেও সোনার থালার চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। সকলের কাছেই যে দেয় এ কথাও বলিতে পারি না। বহু আড়ম্বরের ভোজে অপমান স্বীকার করিয়াও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত এমন লোকও অনেক দেখা যায়। কেন দেখা যায়? কারণ, ভোজের বড়ো তাৎপর্য বৃহৎ সৌন্দর্য সে বোঝে না। বস্তুত খাওয়াটা বা সজ্জাটাই ভোজের প্রধান অঙ্গ নহে। কুঁড়ির পাপড়িগুলি যেমন নিজের মধ্যেই কুঞ্চিত তেমনি স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিকেই চিরদিন সংকুচিত, একদিন তাহার বাঁধন ঢিলা করিয়া তাহাকে পরাভিমুখ করিবামাত্র ফোটা ফুলের মতো বিশ্বের দিকে তাহার মিলনমাধুর্যময় অতি সুন্দর বিস্তার ঘটে ; যজ্ঞের সেই ভিতর-দিকটার গভীরতর মঙ্গলসৌন্দর্য যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না তাহার কাছে ভোজ্যপেয়ের প্রাচুর্য ও সাজসজ্জার আড়ম্বরই বড়ো হইয়া উঠে। তাহার অসংযত প্রবৃত্তি, তাহার দানদক্ষিণা-পানভোজনের অতিমাত্র লোভ, যজ্ঞের উদার মাধুর্যকে ভালো করিয়া দেখিতে দেয় না।

শাস্ত্র বলে : শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমাই শক্তিমানের ভূষণ। কিন্তু ক্ষমাপ্রকাশের মধ্যেই শক্তির সৌন্দর্য-অনুভব তো সকলের কর্ম নহে। বরঞ্চ সাধারণ মূঢ় লোকেরা শক্তির উপদ্রব দেখিলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ করে। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। কিন্তু সাজসজ্জার চেয়ে এই লজ্জার সৌন্দর্য কে দেখিতে পায়? যে ব্যক্তি সৌন্দর্যকে সংকীর্ণ করিয়া দেখে না। সংকীর্ণ প্রকাশের তরঙ্গভঙ্গ যখন বিস্তীর্ণ প্রকাশের মধ্যে শান্ত হইয়া গেছে তখন সেই বড়ো সৌন্দর্যকে দেখিতে হইলে উচ্চভূমি হইতে প্রশস্ত-ভাবে দেখা চাই। তেমন করিয়া দেখার জন্য মানুষের শিক্ষা চাই, গাম্ভীর্য চাই, অন্তরের শান্তি চাই।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা গর্ভিণী নারীর সৌন্দর্যবর্ণনায় কোথাও কুণ্ঠাপ্রকাশ করেন নাই। য়ুরোপের কবি এখানে একটা লজ্জা ও দীনতা বোধ করেন। বস্তুত গর্ভিণী রমণীর যে কান্তি সেটাতে চোখের উৎসব তেমন নাই। নারীত্বের চরম সার্থকতালাভ যখন আসন্ন হইয়া আসে তখন তাহারই প্রতীক্ষা নারীমূর্তিকে গৌরবে ভরিয়া তোলে। এই দৃশ্যে চোখের বিলাসে যেটুকু কম পড়ে মনের ভক্তিতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। সমস্ত বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িয়া শরতের যে হালকা মেঘ বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগাইয়া উড়িয়া বেড়ায় তাহার উপরে যখন অস্ত-সূর্যের আলো পড়ে তখন রঙের ছটায় চোখ ধাঁদিয়া যায়। কিন্তু আষাঢ়ের যে নূতন ঘনমেঘ পয়স্বিনী কালো গাভীটির মতে আসন্ন বৃষ্টির ভারে একেবারে মন্থর হইয়া পড়িয়াছে, যাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলতার মধ্যে বর্ণ বৈচিত্র্যের চাপল্য কোথাও নাই, সে আমাদের মনকে চারি দিক হইতে এমন করিয়া ঘনাইয়া ধরে যে কোথাও যেন কিছু ফাঁক রাখে না। ধরণীর তাপশান্তি, শস্যক্ষেত্রের দৈন্যনিবৃত্তি, নদীসরোবরের কৃশতা-মোচনের উদার আশ্বাস তাহার স্নিগ্ধ নীলিমার মধ্যে যে মাখানো; মঙ্গলময় পরিপূর্ণতার গম্ভীর মাধুর্যে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে। কালিদাস তো বসন্তের বাতাসকে বিরহী যক্ষের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এ কার্যে তাহার হাতযশ আছে বলিয়া লোকে রটনা করে ; বিশেষত উত্তরে যাইতে হইলে দক্ষিণা-বাতাসকে কিছুমাত্র উজানে যাইতে হইত না। কিন্তু কবি প্রথম আষাঢ়ের নূতন মেঘকেই পছন্দ করিলেন ; সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে, সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্তা প্রণয়িনীর কানের কাছে প্রলপিত করিবে? সে যে সমস্ত পথটার নদীগিরিকাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছলছল করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং জনপদবধূর ভ্রূবিলাসহীন প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরো জুড়াইয়া যাইবে। বিরহীর বার্তাপ্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলব্যাপারের সঙ্গে পদে পদে গাঁথিয়া গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্যরসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।

কুমারসম্ভবের কবি অকালবসন্তের আকস্মিক উৎসবে পুষ্পশরের মোহ-বর্ষণের মধ্যে হরপার্বতীর মিলনকে চূড়ান্ত করিয়া তোলেন নাই। স্ত্রীপুরুষের উন্মত্ত সংঘাত হইতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সেই প্রলয়াগ্নিতে আগে তিনি শান্তিধারা বর্ষণ

করিয়াছেন, তবে তো মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন। কবি গৌরীর প্রেমের সর্বাপেক্ষা কমনীয় মূর্তি তপস্যার অগ্নির দ্বারাই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। সেখানে বসন্তের পুষ্পসম্পদ ম্লান, কোকিলের মুখরতা স্তব্ধ। অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও প্রেয়সী যেখানে জননী হইয়াছেন, বাসনার চাঞ্চল্য যেখানে বেদনার তপস্যায় গাম্ভীর্যলাভ করিয়াছে, যেখানে অনুতাপের সঙ্গে ক্ষমা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানেই রাজদম্পতির মিলন সার্থক হইয়াছে। প্রথম মিলনে প্রলয়, দ্বিতীয় মিলনেই পরিত্রাণ। এই দুই কাব্যেই শান্তির মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, যেখানেই কবি সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার তুলিকা বর্ণবিরল, তাঁহার বীণা অপ্রমত্ত।

বস্তুত সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতিলাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণ-গন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে ; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনোই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবন-যাত্রার উপকরণ সাদাসিধা হইয়া থাকে; সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল? তাঁহার রাজবাটীর ভিতরে কোনো চিহ্নও তো দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই। এই ভারতবর্ষে কত দুর্গম গিরিশিখরে, কত নির্জন সমুদ্রতীরে, কত দেবালয় কত কলাশোভন পুণ্যকীর্তি দেখিতে পাই, কিন্তু হিন্দু-রাজাদের বিলাসভবনের স্মৃতিচিহ্ন কোথায় গেল? রাজধানী-নগর ছাড়িয়া অরণ্যপর্বতে এই সমস্ত সৌন্দর্যস্থাপনের কারণ কী? কারণ আছে। সেখানে মানুষ নিজের সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বারা নিজের চেয়ে বড়োর প্রতিই বিস্ময়পূর্ণ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছে। মানুষের রচিত সৌন্দর্য দাঁড়াইয়া আপনার চেয়ে বড়ো সৌন্দর্যকে দুই হাত তুলিয়া অভিবাদন করিতেছে। নিজের সমস্ত মহত্ত্ব দিয়া নিজের চেয়ে মহত্তরকেই নীরবে প্রচার করিতেছে। মানুষ এই-সকল কারুপরিপূর্ণ নিস্তব্ধ ভাষার দ্বারা বলিয়াছে, দেখো, চাহিয়া দেখো, যিনি সুন্দর তাহাকে দেখো, যিনি মহান্ তাহাকে দেখো। সে এ কথা বলিতে চাহে নাই যে, আমি কতবড়ো ভোগী সেইটে দেখিয়া লও। সে বলে নাই, জীবিত অবস্থায় আমি যেখানে বিহার করিতাম সেখানে চাও, মৃত অবস্থায় আমি যেখানে মাটিতে মিশাইয়াছি সেখানেও আমার মাহিমা দেখো। জানি না, প্রাচীন হিন্দুরাজারা নিজেদের প্রমোদ-ভবনকে তেমন করিয়া অলংকৃত করিতেন কি না, অন্তত ইহা নিশ্চয় যে, হিন্দুজাতি সেগুলিকে সমাদর করিয়া রক্ষা করে নাই ; যাহাদের গৌরব প্রচারের জন্য তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গেই আজ সে-সমস্ত ধুলায় মিশাইয়াছে। কিন্তু মানুষের শক্তি মানুষকে ভক্তি যেখানে নিজের সৌন্দর্যরচনাকে

ভগবানের মঙ্গলরূপের বামপার্শ্বে বসাইয়া ধন্য হইয়াছে সেখানে সেই মিলনমন্দিরগুলিকে অতিদুর্গম স্থানেও আমরা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্যের, বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ। সকল সভ্যতার মধ্যেই এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে। একদিন নিশ্চয় আসিবে যখন সৌন্দর্য ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা বদ্ধ, ঈর্ষার দ্বারা বিদ্ধ, ভোগের দ্বারা জীর্ণ হইবে না ; শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে নির্মলভাবে স্ফূর্তি পাইবে। সৌন্দর্যকে আমাদের বাসনা হইতে, লোভ হইতে, স্বতন্ত্র করিয়া না দেখিতে পাইলে তাহাকে পূর্ণভাবে দেখা হয় না। সেই অশিক্ষিত অসংযত অসম্পূর্ণ দেখায় আমরা যাহা দেখি তাহাকে আমাদিগকে তৃপ্তি দেয় না, তৃষ্ণাই দেয় ; খাদ্য দেয় না, মদ খাওয়াইয়া আহারের স্বাস্থ্যকর অভিরুচি পর্যন্ত নষ্ট করিতে থাকে।

এই আশঙ্কাবশতই নীতিপ্রচারকেরা সৌন্দর্যকে দূর হইতে নমস্কার করিতে উপদেশ দেন। পাছে লোকসান হয় বলিয়া লাভের পথ মাড়াইতেই নিষেধ করেন। কিন্তু যথার্থ উপদেশ এই যে, সৌন্দর্যের পূর্ণ অধিকার পাইব বলিয়াই সংযমসাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য সেইজন্যই, পরিণামে শুষ্কতালাভের জন্য নহে।

সাধনার কথা যখন উঠিল তখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ সাধনার সিদ্ধি কী? ইহার শেষ কোন্‌খানে? আমাদের অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি, কিন্তু সৌন্দর্যবোধ কিসের জন্য আমাদের মনে স্থান পাইয়াছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সৌন্দর্যবোধের রাস্তাটা কোন্‌দিকে চলিয়াছে সে কথাটা আর-একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

সৌন্দর্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয় তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্রই চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে একদিকে সুন্দর ও আর-একদিকে অসুন্দর এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দিষ্ট। তার পরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্যবোধের সহায় হয় তখন সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে। তখন যে জিনিস আমাদের মনকে টানে সেটা হয়তো চোখ মেলিবামাত্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়া মনে না হইতেও পারে। আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য দেখিয়া যেখানে আমরা আনন্দ পাই সেখানে আমরা চোখ-ভুলানো সৌন্দর্যের দাসখত তেমন করিয়া আর মানি না। তার পরে কল্যাণবুদ্ধি যেখানে যোগ দেয় সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরো বাড়িয়া যায়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরো ঘুচিয়া যায়। সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন, কেবল রূপসী নহে। যেখানে ধৈর্য-বীর্য ক্ষমা-প্রেম আলো ফেলে সেখানে রঙচঙের আয়োজন আড়ম্বরের কোনো প্রয়োজনই আমরা বুঝি না। কুমারসম্ভব কাব্যে ছদ্মবেশী মহাদেব তাপসী উমার নিকট শংকর রূপ গুণ বয়স বিভবের নিন্দা করিলেন, তখন উমা কহিলেন ; মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্। তাহার প্রতি আমার মন একমাত্র ভাবের রসে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং আনন্দের জন্য আর-কোনো উপকরণের প্রয়োজনই নাই। ভাবরসে সুন্দর-অসুন্দরের কঠিন বিচ্ছেদ দূরে চলিয়া যায়।

তবু মঙ্গলের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভালোমন্দের একটা সংঘাতের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এমনতরো দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুর পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। পরিণাম এক বৈ দুই নহে। নদী যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাহার দুই কূলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু যেখানে তাহার চলা শেষ হয় সেখানে একমাত্র অকূল সমুদ্র। নদীর চলার দিকটাতে দ্বন্দ্ব, সমাপ্তির দিকটাতে দ্বন্দ্বের অবসান। আগুন জ্বালাইবার সময় দুই কাঠে ঘষিতে হয়, শিখা যখন জ্বলিয়া উঠে তখন দুই কাঠের ঘর্ষণ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।

তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রেই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য।

এই চঞ্চল সংসারে আমরা সাত্যের আস্বাদ কোথায় পাই? যেখানে আমাদের মন বসে। রাস্তার লোক আসিতেছে যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া, তাহাদের উপলব্ধি আমাদের কাছে নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নাই। বন্ধুর সত্য আমাদের কাছে গভীর, সেই সত্য আমাদের মনকে আশ্রয় দেয় ; বন্ধুকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি সে আমাদিগকে ততখানি আনন্দ দেয়। যে দেশ আমার নিকট ভূবৃত্তান্তের অন্তর্গত একটা নামমাত্র সে দেশের লোক সে দেশের জন্য প্রাণ দেয়। তাহারা দেশকে অত্যন্ত সত্যরূপে জানিতে পারে বলিয়াই তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। মূঢ়ের কাছে যে বিদ্যা বিভীষিকা বিদ্বানের কাছে তাহা পরমানন্দের জিনিস, বিদ্বান তাহা লইয়া জীবন কাটাইয়া দিতেছে। তবেই দেখা যাইতেছে, যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি সেইখানেই আমরা আনন্দকে দেখিতে পাই। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দের অভাব। কোনো সত্যে যেখানে আমাদের আনন্দ নাই সেখানে আমরা সেই সত্যকে জানি মাত্র, তাহাকে পাই না। যে সত্য আমার কাছে নিরতিশয় সত্য তাহাতেই আমার প্রেম, তাহাতেই আমার আনন্দ।

এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়।

মানবের সমস্ত সাহিত্যে সংগীত ললিতকলা জানিয়া এবং না জানিয়া একই দিকেই চলিতেছে। মানুষ তাহার কাব্যে চিত্রে শিল্পে সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। পূর্বে যাহা চোখে পড়িত না বলিয়া আমাদের কাছে অসত্য ছিল কবি তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে আনিয়া আমাদের সত্যের রাজ্যের, আনন্দের রাজ্যের, সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন। সমস্ত তুচ্ছকে অনাদৃতকে মানুষের সাহিত্য প্রতিদিন সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করিয়া কলাসৌন্দর্য চিহ্নিত করিতেছে। যে কেবল-মাত্র পরিচিত ছিল তাহাকে বন্ধু করিয়া তুলিতেছে। যাহা কেবলমাত্র চোখে পড়িত তাহার উপর মনকে টানিতেছে।

আধুনিক কবি বলিয়াছেন : **Truth is beauty, beauty truth**। আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে **Truth** এবং **Beauty** মূর্তিমতী। উপনিষদও বলিতেছেন : আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌-বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার

আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth এবং beauty সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।

সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই তখনই তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্যে কলাকৌশলেরসৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার ? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্যদ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে ; ইহাতেই সৃষ্টিনৈপুণ্য ; ইহাই সাহিত্য, ইহাই সংগীত, ইহাই চিত্রকলা।

মরুভূমির বালুময় বিস্তারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহাকে দুই পিরামিডের বিস্ময়চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে। নির্জন দ্বীপের সমুদ্র-তটকে মানুষ পাহাড়ের গায়ে কারুকৌশলপূর্ণ গুহা খুদিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, বলিয়াছে 'ইহা আমার হৃদয়ে তৃপ্ত করিল'—এই চিহ্নই বোম্বাইয়ের হস্তিগুহা। পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া মানুষ সমুদ্রের মধ্যে সূর্যোদয়ের মহিমা দেখিল, অমনি বহুশতক্রোশ দূর হইতে পাথর আনিয়া সেখানে আপনার করজোড়ের চিহ্ন রাখিয়া দিল ; তাহাই কনারকের মন্দির। সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে সেইখানেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও-বা মূর্তি, কোথাও-বা মন্দির, কোথাও-বা তীর্থ, কোথাও-বা রাজধানী। সাহিত্যেও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে-কোনো ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এমনি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য উত্তরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। এমনি করিয়া মানুষ জলে স্থলে আকাশে, শরতে বসন্তে বর্ষায়, ধর্মে কর্মে ইতিহাসে অপরূপ চিহ্ন কাটিয়া কাটিয়া সত্যের সুন্দর মূর্তির প্রতি মানুষের হৃদয়কে নিয়ত আহ্বান করিতেছে। দেশে দেশে কালে কালে এই চিহ্ন এই আহ্বান, কেবলই বিস্তৃত হইয়া চলিতেছে। জগতে সর্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সংকীর্ণ হইয়া থাকিত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুলপরিমাণে আমাদের হৃদয়ে জগৎ হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রধান কারণ, মানুষের সাহায্যে হৃদয়ের আবিষ্কারচিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণ-পরম্পরা, সে কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে। কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে ; রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।

পৌষ ১৩১৩